দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ
সামাজিক শ্রেণি-বিন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, শ্রেণিবোধ ও মানস বৈশিষ্ট্য

LIBRARY
NBU. DARJEELING
272063
09 AUG 2015

সামাজিক শ্রেণি-বিন্যাসে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব, ক্রমবিকাশ, শ্রেণিবোধ ও মানস বৈশিষ্ট্য

সমাজতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হ'ল 'সমাজের স্তরবিন্যাস' বা বিভিন্ন সমাজে ব্যক্তি ও দল বিশেষের সামাজিক অবস্থান তথা মর্যাদা নির্ণয়। বস্তুত, সমাজবদ্ধ মানুষদের বিভিন্ন শ্রেণি বা স্তরে বিভক্ত করলে তাদের মধ্যে ক্ষমতা ও মর্যাদার যে সোপান রচিত হয়, তাকেই 'সামাজিক স্তরবিন্যাস' বা 'social-stratification' বলে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক অসাম্য বা পদবিন্যাস ব্যবস্থাকে সমাজতত্ত্ববিদগণ মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। এগুলো হ'ল — (ক) 'দাস প্রথা' (Slavery), (খ) 'স্টেট প্রথা' (Estates), (গ) 'বর্ণপ্রথা' (Caste), এবং (ঘ) 'সামাজিক শ্রেণি ও মর্যাদাগোষ্ঠী' (Social class and Status group)। [১]

আইন ও প্রথা যখন একজন মানুষকে অন্যের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করে, তখন সে একজন 'দাস'। ক্ষেত্র বিশেষে সেই লোকটি সম্পূর্ণ অধিকারহীন, যন্ত্রবিশেষ। এই প্রথা চরম অসাম্যের প্রতীক। প্রাচীন গ্রীস ও রোম এবং আমেরিকায় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই 'দাস প্রথা' প্রচলিত ছিল।

'স্টেট' ধরণের স্তরবিন্যাস সামন্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবস্থা কতকগুলো পরস্পর উচ্চ-নীচ সামাজিক স্তরের সমষ্টি, যেগুলো একে অন্য থেকে স্পষ্টভাবে পৃথক এবং আইন ও আচার প্রথার দ্বারা কঠোরভাবে এই পার্থক্য চিহ্নিত। এ ধরণের স্তরবিন্যাস ব্যবস্থার প্রকৃতিটি মোটামুটি এ রকম— সমাজের একেবারে উঁচুতে অবস্থান করে থাকত একটি রাজকীয় পরিবার এবং একটি ভূম্যাধিকারী, বংশগত সামরিক অভিজাত শ্রেণি। এর ঠিক পরেই অবস্থান করে পুরোহিতবর্গ ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়। এঁদের পরের স্তরে ছিলেন বণিক ও কারিগর। একেবারে শেষ স্তরে অবস্থান করত মুক্ত কৃষক ও অমুক্ত ভূমিদাস। প্রত্যেকটি 'স্টেটে'র অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল সুনির্দিষ্ট এবং এ-সব সামাজিক অবস্থান উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য ছিল। য়ুরোপীয় সামন্তবাদ ও এশিয়ার জাপানের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ ধরণের স্তরবিন্যাস বিকাশ লাভ করেছিল বলে জানা যায়।

'বর্ণপ্রথা' আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক স্তরবিন্যাসের ধারায় একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই প্রথানুসারে প্রতিটি হিন্দুর বর্ণগত অবস্থান জন্মসূত্রে নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয়। এই ব্যবস্থায় চারটি সনাতন বর্ণের কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে। যথা— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এই বর্ণগুলোর মধ্যে আবার বিভিন্ন কার্যকরী উপদল অথবা 'জাতি' রয়েছে। 'জাতি'গুলো অন্তঃবিবাহী দল এবং সুনির্দিষ্ট জীবনযাপন রীতির অনুসারী। পণ্ডিতদের মতে, " আর্যদের ভারতে আগমনের পর বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত স্থানীয়দের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার বিধিনিষেধ 'ট্যাবু'গুলোকে সংহত ও সুদৃঢ় করে তাদের ও স্থানীয়দের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়াস থেকেই এই 'বর্ণপ্রথা'র সূচনা হয়।" [২]

'সামাজিক শ্রেণিসমূহ'ও কার্যত এক একটি দল। তবে- এই দলগুলি আইনত বা ধর্মীয়ভাবে নির্দিষ্ট নয়। য়ুরোপে প্রধানত শিল্পযুগের সূচনা থেকে 'সামাজিক শ্রেণি'র বিকাশ ঘটেছে। মোটামুটিভাবে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী সমাজে চারটি 'সামাজিক শ্রেণি' সনাক্ত করা যায়— (ক) 'উচ্চ শ্রেণি' — উৎপাদনের উপকরণ ও যাবতীয় সম্পদের মালিক, (খ) 'শ্রমিক শ্রেণি' — প্রধানত শিল্পশ্রমিক, (গ) 'মধ্যবিত্ত শ্রেণি' — ধোপদুরস্ত শ্রমিক বা White-collar workers এবং পেশাজীবী শ্রেণি, এবং (ঘ) ' কৃষিখামারী'। উল্লিখিত এই চারটি বিভাগ আসলে চারটি সামাজিক 'শ্রেণি'। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পুঁজিবাদী শিল্পোন্নত সমাজের স্তরবিন্যাস ব্যবস্থাটির মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে আরেকটি 'গোষ্ঠী'র অস্তিত্বের ফলে,—যাঁদের সমাজতাত্ত্বিকেরা 'মর্যাদাগোষ্ঠী' বা

'Status Group' বলে থাকেন। বস্তুত, 'শ্রেণি' ও 'মর্যাদাগোষ্ঠী'-র মধ্যে প্রকৃষ্ট পার্থক্য রয়েছে। 'সামাজিক শ্রেণিসমূহ' উৎপাদন ও উৎপন্ন দ্রব্যের সাথে তাদের সম্পর্কের ভিত্তিতে স্তরবিন্যস্ত হয়; আর— 'মর্যাদাগোষ্ঠী' তাদের জীবনরীতির মধ্যে প্রতিফলিত ভোগ্যপণ্যের ব্যবহারের নীতিতে স্তরবিন্যস্ত হয়।

সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন কার্ল মার্কস। তাঁর বিশ্লেষণে পুঁজিবাদী সমাজে 'শ্রেণি'-ই হ'ল মুখ্য উপাদান এবং 'শ্রেণি সংগ্রাম'-ই হ'ল ইতিহাসের চালিকাশক্তি। সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে ইতিহাসের ধারা অনুধাবন করতে গিয়ে মার্কস ও এঙ্গেল্‌স জানিয়েছেন যে— " আজ পর্যন্ত বিদ্যমান সকল সমাজের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।" [৩] মার্কস ও এঙ্গেলস রচিত 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তিহারে'র অন্তর্গত 'বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত' শিরোনামাঙ্কিত প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, কীভাবে সমাজ ব্যবস্থা এক স্তর থেকে আরেক স্তরে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক যন্ত্রশিল্প-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় অতিকায় সব শিল্প গড়ে উঠেছে এবং আত্মপ্রকাশ করেছে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজ—যার একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী শ্রেণি, আর অন্যদিকে রয়েছে 'প্রলেতারিয়েত'। মার্কস ও এঙ্গেলস বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যবর্তী স্তরে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা অংশের উদ্ভব ও তাদের আন্তঃসম্পর্ক এবং পারস্পরিক অবস্থা বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। কিন্তু, লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের আলোচনায় কখনই 'মধ্যবিত্ত' কথাটি ব্যবহার করেননি। তবে— বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যবর্তী স্তরের বিভিন্ন অংশকে, যেমন— কৃষক, ছোট ব্যবসায়ী, দোকানদার, হস্তশিল্পী, বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তিভোগীদের 'পেটি বুর্জোয়া' বলে উল্লেখ করেছেন।

সাধারণভাবে বিত্তের অধিকারী হিসেবে একেবারে উচ্চস্তরেও নয়, আবার - একেবারে নিম্নস্তরেও নয়; মধ্যবর্তী স্তরে যাদের অবস্থান— তাদেরই 'মধ্যবিত্ত' সামাজিক শ্রেণি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু, প্রকৃত তাৎপর্যে ঠিক এভাবে 'মধ্যবিত্ত'দের যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধে রয়েছে। প্রথমত, 'বিত্ত' যদি শ্রেণি নির্ণয়ের মানদণ্ড হয়, তাহলে 'বিত্তে'র বিচারে কেউ হবেন উচ্চ-মধ্যবিত্ত আর কেউ নিম্ন-মধ্যবিত্ত। সাধারণত 'উচ্চ-মধ্যবিত্ত' সামাজিক শ্রেণির মানুষেরা শিক্ষাগত বা পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো বড় চাকুরি বা বৃত্তিভোগী। তাদের জীবনযাত্রা বেশ স্বচ্ছল। অপরদিকে, নিম্ন-মধ্যবিত্তদের উপার্জনের জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে হয় এবং তাদের জীবনযাত্রাও তুলনামূলক অস্বচ্ছল। কিন্তু, সমস্যা হ'ল — " বিত্ত হয়তো আগে কোনো এককালে কিছুটা ছিল, এখন আর কানাকড়িও নেই, বলতে গেলে একেবারেই নিঃস্ব, তবু এমন মানুষও আছেন যাঁকে জিজ্ঞাসা করলে বলবেন তিনি 'মধ্যবিত্ত' ... 'মধ্যবিত্ত' কথাটা তাঁর কাছে স্বতন্ত্র মর্যাদার পরিচায়ক।" [৪] প্রশ্ন উঠে যায়, 'মধ্যবিত্ত' কথাটি যদি স্বতন্ত্র মর্যাদারই পরিচায়ক হয়ে থাকে,তাহলে সেই কপর্দকহীন মধ্যবিত্ত মানুষটিকে যখন পাওনাদার নিরন্তর তাগাদা দিতে থাকে, তখন তাঁর সেই 'মর্যাদা' কোথায় থাকে? সুতরাং, 'উপার্জন' বা 'বিত্তে'র কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠিও নেই যার দ্বারা 'মধ্যবিত্ত' মানুষটিকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, কেউ কেউ মনে করে থাকেন যে, 'বিত্ত' নয়— অধীত বিদ্যার মাপকাঠিতেই 'মধ্যবিত্ত'র স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করা যেতে পারে। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এমনও নজির রয়েছে যাঁরা 'বিত্ত' নয়, জীবনচর্যায় উৎকর্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে সমাজে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু, এক্ষেত্রেও প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় 'বিত্তে'র মতোই অধীত বিদ্যারও কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপ বা মাপকাঠি নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, 'বিত্ত' বা 'অধীত বিদ্যা' কোনোটিরই নির্দিষ্ট মাপকাঠি দিয়ে 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণিকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় না। তাহলে কি 'রুচি'? — 'রুচি'-র মানদণ্ডেও 'মধ্যবিত্তে'র শ্রেণি নির্ণয় সম্ভব নয়;

কেননা— 'রুচি' ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল পূর্বে লেখা একটি প্রবন্ধে রমাপদ চৌধুরী লিখেছেন —

> বর্ণাশ্রমের দেশে সমাজ তো চার ভাগে ভাগ হয়েই ছিল, কোন এক অপ্রাচীন আমলে কেউ 'মধ্যবিত্ত' শব্দটা চালু করলেন শুধুমাত্র বিত্তের দিকে দৃষ্টি রেখে, সঙ্গে সঙ্গে বর্ণের বদলে বিত্ত অনুযায়ী আমরা তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেলাম। কিন্তু কালক্রমে তার পরিচয় আর বিত্তের খুঁটিতে বাঁধা রইল না। আজকের দিনে তিনশো টাকা মাসিক বেতনের কনিষ্ঠ কেরানির বেকার পুত্রটি থেকে শুরু করে তিন হাজারী আধুনিক মনসবদার অবধি কে নিজেকে 'মধ্যবিত্ত' ভাবেন না? প্রয়োজনে বড়জোর কেউ নিম্ন কেউ উচ্চ। তা হ'লে কি মধ্যশ্রেণির পরিচয় বিত্তে ততটা নয়, যতটা শিক্ষায় বা আচারে? তাই বা কী করে বলি। বহুরূপী তো ক্ষণে ক্ষণে রঙ্ পাল্টায়। কখনো সে পাখার তলায় হাতলহীন চেয়ারে বসা তিনশো টাকার বাবু, কখনো তারই সেই অপদার্থ ভাই, যিনি কদাপি পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ করতে পারেননি, কিন্তু ক্ষুদে স্টেশনারি দোকান পরিচালনায় সিদ্ধহস্ত। মধ্যবিত্তকে উঁচু চেয়ারেও পাওয়া যাবে, আসনহীন কলে-কারখানাতেও। উপার্জন বা অধীত বিদ্যা বা রুচির এমন কোন মাপকাঠি নেই যা দিয়ে তার পরিমাপ করা যায়। পার্কস্ট্রিটের মদ্যবাসরে বা ক্লাবে-পার্টিতে যাঁকে প্রচণ্ড আধুনিক মনে হয়, বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে ফিরে আসার পর একটু নখের আঁচড় লাগলেই সংস্কারে আচ্ছন্ন মধ্যবিত্ত মানুষটাই বেরিয়ে পড়ে তাঁরও ভিতর থেকে।[৫]

সাম্প্রতিককালে অনেকেই মনে করে থাকেন যে, বিত্ত নয়, বিদ্যা নয়, রুচি নয়, 'মধ্যবিত্ত' আসলে একপ্রকার মানসিকতা। এই 'মধ্যবিত্ত মানসিকতা'র পরিচয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে তুলে ধরা যেতে পারে। বর্তমান সময়কার বিভিন্ন বৃহদাকার 'শপিং কমপ্লেক্স' বা 'শপিং মল' — যেখানে প্রায় প্রতিটি শ্রেণিসমাজের লোকেদেরই এক সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। ধরা যাক, সেখানকার একটি অভিজাত বস্ত্র প্রতিষ্ঠানে একটি ভালো বস্ত্র ক্রেতাদের সামনে প্রদর্শিত হচ্ছে। একজন ক্রেতা দূর থেকে একবার মাত্র বস্ত্রটির দিকে তাকিয়ে নিজের অসামর্থ্যের কথা ভেবে—বস্ত্রটি কেনার কথা না ভেবেই পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন।দ্বিতীয় একজন ক্রেতার মনে প্রবল ইচ্ছে হ'ল সেই বস্ত্রটিকে কিনে নেবার জন্যে। কিন্তু, বস্ত্রটির মূল্যের কথা ভেবে তিনি কিনবেন কি কিনবেন না—ইতস্তত করতে লাগলেন। এমন সময় তৃতীয় একজন ক্রেতা উপস্থিত হলেন। দোকানদার তাঁকে দেখে একটু আলাদা অভ্যর্থনা জানালেন। তৃতীয় এই ব্যক্তিটি প্রদর্শিত বস্ত্রটি পছন্দ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে 'প্যাক' করে দিতে বললেন। বস্ত্রটির মূল্যের কথা তিনি জানতেও চাইলেন না। 'বিল' হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা মিটিয়ে দিয়ে তিনি দ্রুত পদে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। লক্ষণীয়, এখানে প্রথম যে ব্যক্তিটির কথা বলা হয়েছে, তিনি 'নিম্নবিত্তে'র অধিকারী। তৃতীয় জন 'উচ্চবিত্ত' এবং যিনি বস্ত্রটির মূল্যের কথা ভেবে কিনবেন কি কিনবেন না — এ রকম ইতস্ততবোধ করছিলেন তিনিই 'মধ্যবিত্ত' এবং তাঁর ক্রমাগত ইতস্তত করা 'মধ্যবিত্ত মানসিকতা'। এই ক্রমাগত 'ইতস্তত' করার মানসিকতার পরিচয়টি আমরা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসেও একটু অন্যভাবে প্রকাশিত হতে দেখেছি। তাঁর 'বামুনের মেয়ে' (১৯২০) উপন্যাসে ব্রাহ্মণ গোলক চাটুজ্যে মধ্যবিত্ত মানসিকতার অধিকারী। গরু চালানের ব্যবসায় টাকা খাটানো ঠিক হবে কিনা— এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত প্রবলভাবে 'ইতস্তত'বোধ করেছিলেন। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণি নির্ণয়ে 'বিত্তে'র নির্দিষ্ট মাপকাঠি না থাকলেও 'বিত্ত'ই কিন্তু তার মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ কারণেই দেখা যায়, হাটে-বাজারে, শপিং কমপ্লেক্সে মাসের শুরুতে যেমন ভিড় উপচে পড়ে, মাসের শেষের দিকে তেমন ভিড় থাকে না। আবার- এই 'বিত্ত'কেন্দ্রিক মানসিকতারও রকমফের আছে। কেউ চাকুরি জীবনে আসন্ন অবসর জীবনের কথা ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, প্রফিডেন্ট ফাণ্ডে প্রতি মাসে কত টাকা জমালে ভবিষ্যৎ আসন্ন অবসর জীবন নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবেন— এই ভেবে পথ খুঁজে পান না। আবার এমনও দেখা গেছে যে, কোনো এক সরকারী অফিসের চাকুরে—যিনি ব্যক্তিগত জীবনে সব সময়েই ছিলেন

অত্যন্ত মিতব্যয়ী, চাকুরি জীবন থেকে অবসর নেবার পর তাঁর যাবতীয় সঞ্চয় দান করে দিলেন একটি ক্যান্সার হাসপাতালের তহবিলে (দ্রষ্টব্য— রমাপদ চৌধুরী রচিত 'মানুষের সংসার' উপন্যাসের হরপ্রসাদ)। সুতরাং, বিত্তকেন্দ্রিক মানসিকতার পরিচয়েও মধ্যবিত্তের নির্দিষ্ট চেহারাটি ফুটে ওঠে না। আসলে 'মধ্যবিত্তে'র প্রকৃত কোন সংজ্ঞা নেই। না অর্থে, না শিক্ষায়, না পেশায়। তবে, 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণির মানুষের আচরণের মধ্যে এক ধরণের 'বাবু' মানসিকতা রয়েছে। শুধু বাঙালি নয়, সারা পূর্বভারতেই 'ভদ্রলোক' বলতে 'মধ্যবিত্ত' এবং 'মধ্যবিত্ত' বলতে এই বাবুদেরই বোঝায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই বাবুরা —

> বাটারফ্লাই গোঁফে আতর লাগাতো, কোঁচানো ধুতির তোড়া হাতে নিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াতো, বাঈ নাচাতো, ঘুড়ি লড়াতো, পায়রা ওড়াতো ... তখন যারা সমাজ সংস্কার করেছে, মেয়েদের ইস্কুল খুলেছে, কবিকে পুরস্কৃত করেছে, দুঃসাহসী নাটক মঞ্চস্থ করেছে,গানের সমঝদার হয়েছে, মহাভারত কিংবা পুরাণ অনুবাদ করেছে এবং মিল বা কোঁতের মতবাদ নিয়ে তুমুল ঝড় তুলেছে, কুসংস্কার ভেঙে মেডিকেল কলেজে মড়া কেটেছে এবং বন্দেমাতরম্ মন্ত্র দিয়েছে, তাদের ঠিকানার বেলায় নামের আগে বাবু বসতো, সম্বোধনে নামের পরে, অর্থকৌলীন্যের ফলেই নয়, সাংস্কৃতিক কারণেও এই বাবুরাই কখনো কখনো 'রাজা' উপাধি পেয়ে গেছেন, একালে পদমর্যাদায় যেমন বিলেতি উকিলবাবু হয়ে যান ব্যারিস্টার সাহেব, এবং বিলেত ফেরত না হ'লেও বিচারককে বলি জজসাহেব। তাছাড়া বোসবাবু বা দত্তবাবুও দু'ধাপ প্রোমোশন পেয়ে অফিসার বনে গেলেই হয়ে যান বোসসাহেব বা দত্তসাহেব। ...আসলে এই বাবু মানসিকতা ছাড়া মধ্যবিত্তের আর কোন সংজ্ঞা নেই, সাহেব হয়ে যাওয়ার পরও সে মানসিকতা ভিতরে ভিতরে থেকেই যায়। ছাত্রাবস্থায় যে ছেলেটি সিনেমা হলের সামনে পঁচাত্তর পয়সার সুলভতম টিকিটের জন্যে কিউ দেয়, একদা বেশ স্থূল বেতনের চাকরি পেয়ে সুসজ্জিত বউকে সঙ্গে নিয়ে সেই ব্যক্তিটিই ব্যালকনির দুর্মূল্য আসনটির শোভাবর্ধন করে। [৬]

রমাপদ চৌধুরী আরো বলেন —

> আমাদের শৈশবে এই মেজবাবুটির চেহারা একেবারে অন্যরকম ছিল। কোনরকম কায়িক পরিশ্রম ইনি পছন্দ করতেন না। বিদ্যাসাগরী গল্পের মতোই ইনি একটি গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ বয়ে নিয়ে যাওয়ার লজ্জায় প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে 'কুলি', 'কুলি' বলে চেঁচাতেন, বাজারে যেতেন একটি বালকভৃত্য সঙ্গে নিয়ে, কিংবা বাজার থেকে ফিরতেন পুচ্ছবৎ ঝাঁকামুটে সমভিব্যাহারে। [৭]

কিন্তু, কালক্রমে মধ্যবিত্তের মন, মেজাজ, রুচি—সবেতেই পরিবর্তন ঘটেছে, আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে তাদের সকলেরই জীবনাচরণে। তবে, মধ্যবিত্ত যতই আধুনিক হোন কিংবা বড় চাকুরে, অথবা অর্থবান, তার আশেপাশেই থাকে দুঃস্থ পিসিমা, দরিদ্র মেসোমশাই বা বিধবা জ্যেঠি। মেয়ের বিয়ে, পিতার শ্রাদ্ধ — নানা কারণে এদের সকলের সঙ্গেই যোগাযোগ রেখে চলতে হয় মধ্যবিত্ত মানুষদের। উপরিউক্ত আলোচনায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা চেহারা তুলে ধরা গেলেও ঠিক কোন্ মানুষটি মধ্যবিত্ত তা খুব একটা পরিচ্ছন্ন নয়। আসলে মধ্যবিত্তের রঙ্গমঞ্চে প্রতিটি মানুষকেই একাধিক চরিত্রে অভিনয় করতে হয়। তার কোন চরিত্রটি যে আসল তা বলা মুশকিল। কলেজে, অফিসে, রেস্তোরাঁয় সে যতক্ষণ তর্করত, ততক্ষণ মনে হবে তার মতো উদার এবং কুসংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী কমই আছে। কিন্তু বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে দেখা যাবে, মাদুলি, তাবিজ, জ্যোতিষে ভক্তি, জাতিভেদ, গোত্র, বারবেলা, পাঁজি দেখা—ইত্যাদি সবই রয়েছে তার মধ্যে। জীবনভাবনায় এই প্রভূত 'কনট্রাডিকশন্' মধ্যবিত্ত বাঙালির চরিত্রগত আরেকটা বিশেষ দিক। রমাপদ চৌধুরী 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণির মানুষদের সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন — " আসলে মধ্যবিত্ত হ'ল সমাজের মধ্যবৃত্ত। বংশানুক্রমে যারা একটি বিশাল নাগরদোলায় বসে আছে। কখনো ওপরে উঠছে কখনো নীচে নামছে, কিন্তু বৃত্তের বাইরে কদাপি নয়।" [৮] বস্তুত 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণির মানুষদের চরিত্রগত যে সমস্ত লক্ষণগুলো আলোচিত হ'ল, ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও বোঝা যায় যে, বিত্তের অধিকারী হিসেবে একেবারে উঁচুতেও নয়, আবার একেবারে নীচেও নয়, মোটামুটিভাবে যারা মধ্যম

বিত্তের অধিকারী, যারা বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশার কাজে নিযুক্ত থেকে আজীবন সংগ্রাম করে যায় যতবেশি সম্ভব সচ্ছল হয়ে উঠতে,অথচ— নিজেদের বৃত্ত ভেঙে তারা কখনই বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে না এবং উল্টো দিক থেকে আর্থিক কারণে পড়ন্ত হলেও কায়িক শ্রমের শ্রমিকদের পর্যায়ে নেমে যেতে পারে না—যারা সারাজীবন নিজেদের আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য করে উঠতে গিয়ে নানাবিধ টানাপোড়েনে ভোগেন, যারা একই সঙ্গে রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল, ক্ষেত্রবিশেষে সমাজ-সংস্কারের বাসনাও যাদের মধ্যে থাকে, শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতাও করেন সময় এবং সুযোগ পেলে— তারাই সাধারণভাবে 'মধ্যবিত্ত' নামে পরিচিত হবার দাবী রাখে। বর্তমান সময়কার একজন প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক-গবেষক সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের এই মধ্যবর্তী স্তরটিকেই সাধারণভাবে 'মধ্যবিত্ত' আখ্যা দিয়েছেন—

> মধ্যবিত্ত ... এই সামাজিক শ্রেণি সমাজবিন্যাসের মধ্যবর্তী স্তর। অর্থাৎ এর ওপরে একটি এবং এর নীচে আর একটি স্তর—মধ্যবর্তী রেখায় এর অবস্থান। অন্যভাবে বলা যায় এই শ্রেণির মানুষের বিত্তের পরিমাণ মাঝারি ধরণের—এদের অতিবিত্ত নেই,আবার এরা বিত্তহীনও নয়। এদের ওপরে বিত্তশালী অভিজাত শ্রেণি যাদের বেশিরভাগ জমিদার আর নীচে কৃষক,শ্রমিক ও কারিগর শ্রেণির মানুষরা। এই দুই শ্রেণি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হল এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি।[৯]

তবে, একালের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা উচ্চবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যেকার যোগসূত্র হিসেবেও পরিচিত। স্বার্থের কারণেই মধ্যবিত্ত মানুষেরা একদিকে উচ্চবিত্ত ও অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণি— উভয়ের সঙ্গেই সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে চায়। বর্তমান সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কি শাসক দল, কি বিরোধী দল—প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা শ্রমিক সংগঠন, কৃষক-ক্ষেতমজুর সংগঠন আছে। নিজেদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য সম্মিলিত শক্তি হিসেবে সোচ্চার হয়ে উঠতেও দেখা যায় এদের। কিন্তু,অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই শ্রমিক বা কৃষক-ক্ষেতমজুরদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মধ্যবিত্ত মানুষেরাই। আরেকটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণি— এমনই একটি শ্রেণি—যারা কর্মক্ষেত্রে স্বল্প শ্রম দান করে এবং যন্ত্রযুগের প্রসারের তালে তালে তারা সমাজে এমন একটা স্থান দখল করে নেয়, যেখানে তাদের ধনিক ও মজুর দুইই মনে হয়। সাধারণ মজুর শ্রেণির মতো এরা কেনা গোলামী করেনা, একথা সত্য; কিন্তু, মেহনত না করেও তাদের নিস্তার নেই।

জনসংখ্যার বিচারে বাংলায় কৃষক সমাজের পরই দ্বিতীয় বৃহত্তম সামাজিক অংশ হ'ল 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণি। বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভবের ইতিহাসটিও ইংল্যাণ্ড ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় পৃথক। যন্ত্রশিল্পের প্রসারের মধ্য দিয়ে ইংল্যাণ্ড ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশে 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণির আবির্ভাব ঘটলেও, বাংলায় ঠিক একই কারণে 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণির আবির্ভাব ঘটেনি। কেননা— বাংলা তথা ভারতবর্ষে ইংল্যাণ্ড বা য়ুরোপের অন্যান্য দেশগুলোর মতো শিল্পবিপ্লব হয়নি। বাংলায় একসময় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়েই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ইংরেজ শাসনের বহু পূর্ব থেকেই বাংলায় 'জমিদার' নামে পরিচিত এক শ্রেণির মানুষের কাজ ছিল কৃষকদের থেকে আদায় করা খাজনা নবাবের কাছারিতে জমা দেওয়া। তাঁরা উত্তরাধিকারসূত্রে এই খাজনা আদায়ের অধিকার লাভ করতেন। জমির উপর তাদের ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকলেও, তাঁরা রাজস্ব আদায়ের অধিকারী ছিলেন। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী' প্রথমে বর্ধমান মেদিনীপুর জেলায়, পরে সারা বাংলায় রাজস্ব আদায়ের ভার পায়। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানি এদেশের জমিদার, ইজারাদার ও তালুকদারদের মধ্যে সর্বোচ্চ রাজস্ব দেওয়ার চুক্তিতে বার্ষিক ভূমি বন্দোবস্ত দিত। নিলামে ডাকা সর্বোচ্চ রাজস্বদাতাকে ভূমিকর আদায়ের অধিকার দিত। সেই সঙ্গে এদেশে ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইজারাদার, বণিক, বেনিয়া, গোমস্তা, দালাল ও মহাজনেরা। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন

করে জমিদারদের ভূমির বংশানুক্রমিক মালিক হিসেবে ঘোষণা করলেন। এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে পরে, জমিদারেরা ইচ্ছেমতো জমির খাজনা বাড়িয়ে দিয়ে কৃষকদের অবাধে শোষণ করার সুযোগ পেয়ে যায়। খাজনা আদায় নিশ্চিত করবার জন্যে জমিদারেরা আবার 'তালুকদার', 'গাঁতিদার'দের নিযুক্ত করেন। কর্ণওয়ালিস তাঁর ভূমি বন্দোবস্তে এই সব 'তালুকদার' ও 'গাঁতিদার'দের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন (সপ্তম ও পঞ্চম আইন,১৭৯৯ ও ১৮১২)। তাছাড়া, ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে বিস্তৃত 'পত্তনি আইন'ও তৈরি হয়। এই আইনের বলে 'পত্তনিদার' স্থায়ীভাবে 'পত্তনি' বা 'তালুক' ভোগদখল করবার অধিকার লাভ করেন। 'পত্তনিদার'রা আবার 'দরপত্তনিদার' এবং 'দরপত্তনিদার'রা 'সেপত্তনিদার'দের সঙ্গে একই রকম বন্দোবস্ত গড়ে তোলে। ক্রমশ এই ব্যবস্থা সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুত এই 'পত্তনি' ব্যবস্থাই বাংলায় ভূমিনির্ভর মধ্যবিত্ত সমাজের উত্থানের পথ প্রশস্ত করে দেয়।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর সূচনা ঘটে নতুন ধরণের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থার। প্রবর্তিত হয় স্টীম ইঞ্জিন, রেলপথ, টেলিগ্রাফ লাইন, মুদ্রণ যন্ত্র। মুদ্রণ যন্ত্রের হাত ধরে প্রকাশিত হতে থাকে বিবিধ সংবাদপত্র। পরিবর্তন ঘটানো হয় আইন ও বিচার ব্যবস্থার, শিক্ষা ব্যবস্থার। গড়ে ওঠে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী; পাশাপাশি —স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়,হাসপাতাল, প্রশাসনিক অফিস, আদালত প্রভৃতি। এই সব ক্ষেত্রে প্রয়োজন দেখা দেয় শিক্ষিত পেশাদার মানুষের। বাংলার ভূমিনির্ভর একশ্রেণির মানুষ লেখাপড়া শিখে চাকুরি লাভের জন্য শহরে গিয়ে ভিড় করতে থাকেন। এঁদের অনেকেই সরকারী কর্মচারী, আইনজীবী, চিকিৎসকের পেশা গ্রহণ করেন। গ্রাম ও শহরের মানুষের মিলিত সমন্বয়ে ক্রমশ এক শক্তিশালী সামাজিক শ্রেণি হিসেবে বাংলায় পেশানির্ভর মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে।

ভূমিনির্ভর বা পেশাগত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভবের পাশাপাশি তৎকালীন বাণিজ্যিক ব্যবস্থাও বাঙালি মধ্যবিত্তের উদ্ভবের সামাজিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলার সঙ্গে ফরাসী, ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি য়ুরোপীয়দের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমদানী করা পণ্যসামগ্রি বিক্রয় এবং রপ্তানীযোগ্য পণ্যসামগ্রি সংগ্রহ করার কাজের সুবিধার্থে বাংলার বিভিন্ন স্থানে য়ুরোপীয় কুঠি বা বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই সব কুঠি বা বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতে ভিড় বাড়তে থাকে এদেশিয় বণিক, মহাজন, দালাল, গোমস্তা, মুৎসুদ্দি ও বেনিয়ানদের। সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, পরবর্তীকালে এঁদের মধ্য থেকেই উদ্ভব ঘটে বাংলার বাণিজ্যাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত সমাজের।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তনের যুগেই বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। কিন্তু, যেকোনো আরম্ভেরই একটা পূর্ব ইতিহাস থাকে, প্রদীপ জ্বালানোর আগে যেমন থাকে সলতে পাকানোর নেপথ্য ক্রিয়া। বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় শক্তিশালী সামাজিক শ্রেণি হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটলেও, ইতিহাস থেকে জানা যায় যে,অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলায় জমি থেকে উপার্জনকারী ও চাকুরীজীবী মধ্যবিত্তর অস্তিত্ব ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ-র আমলে বাংলাদেশের বিভিন্ন পরগনায় যেমন বড় বড় জমিদারী ছিল, তেমনি আবার অনেকগুলি পরগনা ছিল ছোট জমিদার বা তালুকদারদের হাতে। রাজস্ব বিভাগ ও জমিদারী বা তালুকদারী সেরেস্তায় কাজকর্মের জন্যে বহু কর্মী নিয়োজিত হতেন। তাছাড়া, অন্তর্বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত যে 'সওদাগর গোষ্ঠী' গড়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক মধ্যবিত্ত মানুষেরা ছিলেন। এই সময়েই কিছু পেশাদার মধ্যবিত্তরও উদ্ভব ঘটে—যারা প্রধানত চিকিৎসাকার্যে নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন। মোগল যুগে এই সব মধ্যবিত্ত মানুষদের অস্তিত্ব থাকলেও তাঁরা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থেকে ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত থাকতেন; যেমন— চিকিৎসক, শিক্ষক, পুরোহিত, মৌলবী, কারিগর, দোকানদার, শস্য-ব্যবসায়ী, সেরেস্তা

কর্মচারী প্রভৃতি। তবে, একথা ঠিক যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলার সমাজে 'মধ্যবিত্ত' কিছু মানুষ থাকলেও তাঁরা পৃথক সামাজিক শ্রেণি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক ও সমাজকর্মী দীপেন ঘোষ মহাশয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাক্ষ্য অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করে জানিয়েছেন যে,— " উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই বাংলায় এক সুনির্দিষ্ট গোষ্ঠী হিসাবে মধ্যবিত্তর আবির্ভাব ঘটে।"[১০]

উনিশ শতক বাংলার ইতিহাসে নবজাগরণের কাল হিসেবে স্বীকৃত। বস্তুত- বাংলায় এই নবজাগরণের ধারক ও বাহক ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ। সমাজতাত্ত্বিক বিনয় ঘোষ জানিয়েছেন যে— "উনিশ শতকে বাংলাদেশে যে সামাজিক নবজাগরণ ও কুসংস্কারমুক্তির আন্দোলন হয় তা মধ্যবিত্তের সৃষ্টি এবং প্রধানত হিন্দু মধ্যবিত্তের। মধ্যবিত্তের মধ্যে নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই এই পথে অগ্রণী হন। এই সামাজিক নবজাগরণে বাংলার শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের দান নানা দিক থেকে স্মরণীয়।" [১১] ধর্ম-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার, দেশপ্রেম, দেশপ্রেমমূলক সাহিত্য রচনা, ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনা এবং 'জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আধুনিক রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার করা উনিশ শতকের বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের প্রধান প্রধান অবদান।

উনিশ শতকের প্রথম দুই দশক বাঙালি মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'শ্রীরামপুর মিশন' ও 'ফোর্টউইলিয়ম কলেজ'। বাংলা গদ্যের বিকাশে 'ফোর্টউইলিয়ম কলেজ' গোষ্ঠীর অবদান অপরিসীম। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে বেসরকারী উদ্যোগে কলকাতায় 'হিন্দু কলেজ' স্থাপিত হয়। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে গড়ে ওঠে 'কলকাতা বুক সোসাইটি'। ডেভিড হেয়ার ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা ছাড়াও অন্যান্য স্থানে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবার জন্যে এবং ইংরেজি শিক্ষাকে এ দেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তুলবার জন্যে গড়ে ওঠে 'কলকাতা স্কুল সোসাইটি'। 'কলকাতা স্কুল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হবার পর, সোসাইটির সম্পাদক রাধাকান্ত দেব রক্ষণশীল সমাজের পুরোধা হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী-শিক্ষার স্বপক্ষে মত দিয়েছিলেন; যদিও বাড়ির বাইরে স্কুলে গিয়ে তিনি তাঁর নিজের পরিবারের মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিবিধ সংবাদপত্রের প্রকাশ বাঙালি মধ্যবিত্তের আধুনিক মন ও মানসিকতা গড়ে তুলতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছে। একদিকে বাংলা গদ্যের বিকাশ এবং অন্যদিকে বাংলা গদ্যের হাত ধরে বিভিন্ন সাময়িকপত্রের শ্রীবৃদ্ধি — মধ্যবিত্ত বাঙালির জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি চর্চার হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে 'হিন্দু কলেজ' এবং ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে 'সংস্কৃত কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে এবং তাঁদের সামাজিক শ্রেণি-রূপটিও স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্ভাবনা বুঝতে পেরে তার সমাদর করা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সামাজিক শ্রেণির অন্যতম কীর্তি। এই সময়েই 'হিন্দু কলেজে'র কয়েকজন ছাত্র আদর্শবাদী বিদেশী শিক্ষকদের সান্নিধ্যে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করে মানবতাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ বুদ্ধিজীবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও-র অনুগামী, মানবতাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের বলা হ'ত 'ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী'। বস্তুত, 'ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী'র মানবতাবাদী ভাবধারা বাংলার সমাজ বিকাশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ পদসঞ্চার সন্দেহ নেই। কিন্তু, এই গোষ্ঠীর উগ্রতাকে তৎকালীন সমাজের অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তিই মেনে নিতে পারেন নি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী'র সদস্য হওয়া সত্ত্বেও এই গোষ্ঠীর অতিসক্রিয়তা, উগ্রতাকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। তবে একথা

ঠিক যে, 'হিন্দু কলেজ' ও 'ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী'র আবির্ভাবের ফলে শিক্ষিত বাঙালি মানস স্পষ্টত দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। 'ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী'র সদস্যগণ পাশ্চাত্য মানবতাবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী হলেও, ইংরেজি শিক্ষার তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান 'হিন্দু কলেজে'রই প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকদের মধ্যে এমন কয়েকজন ছিলেন, যাঁদের কিছুতেই পাশ্চাত্য 'হিউম্যানিস্ট' আদর্শের সমর্থক বলা সম্ভব নয়। এঁরা 'হিন্দু কলেজে'র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন শুধু বণিকসুলভ স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য। এঁদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন — গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রমুখ। যাই হোক, বিরোধিতা সত্ত্বেও 'ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী'-র মানবতাবাদী আদর্শ বাংলার সমাজে এক ধরণের গতিশীলতা সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছে। পাশাপাশি মহাত্মা রামমোহনের 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠাও সমকালের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন 'আত্মীয়সভা' স্থাপন করেন। এই সভা ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে পরিণত রূপ লাভ করে 'ব্রাহ্মসমাজে'। এই সমাজ হয়ে ওঠে জাতি,ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের মিলনক্ষেত্র। রাজনারায়ণ বসু জানিয়েছেন —

> ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে সর্ জন্ হাইড ইষ্ট এবং ডেভিড হেয়ার এই মহাত্মাদ্বয় প্রথমে ঐ কালেজ সংস্থাপিত করেন। ... এই সময় হইতে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে নব ভাব হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হয় ও সেই ভাব এখনও কার্য্য করিতেছে। কিন্তু হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে, কেবল ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনা যে উহার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, এমত নহে। আর একটি ঘটনা উহার একটি প্রধান কারণ স্বরূপ গণ্য করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ রামমোহন রায় দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন। সমুদায় হিন্দু শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া রামমোহন রায় এই সত্য প্রতিপাদ করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর একমাত্র নিরাকার। তাহাতে অনেকে এইরূপ মনে করিলেন, ইহাতে হিন্দুধর্ম্ম একেবারে নষ্ট হইবে। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে ইহা দ্বারাই হিন্দুধর্ম্ম প্রকৃতরূপে রক্ষিত হইবে। [১২] (পুরানো বানান অপরিবর্তিত)

মনীষী রাজা রামমোহন রায়(১৭৭৪—১৮৩৩) ছিলেন একই সঙ্গে পাশ্চাত্য মানবতাবাদের দীক্ষাগুরু ও দেশীয় ঐতিহ্যের ধারক। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ মহাশয়দের নামও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। রামমোহন রায় যথার্থই ছিলেন নব্যভারতের জনক। তাঁর কলকাতায় অবস্থান ও গ্রন্থপ্রকাশ ইতিহাসের এমন এক শুভক্ষণে, যখন ফরাসী বিপ্লবজাত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্রে সমগ্র য়ুরোপ আন্দোলিত। ফরাসী বিপ্লব থেকে উদ্ভূত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ রামমোহনের চিন্তাধারাকে বহু পরিমাণে পরিপুষ্ট করেছে। বহু ভাষাবিদ রামমোহন বিভিন্ন ভাষার শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ ও গভীর সত্যানুসন্ধিৎসার সমন্বয় ঘটেছিল। সতীদাহ, জাতিভেদ প্রভৃতি হিন্দুসমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। স্ত্রী শিক্ষার সুযোগ দানের ব্যাপারেও তিনি সক্রিয় হয়েছিলেন। ধর্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়ে রামমোহন হিন্দু, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তবে, 'উপনিষদ' চর্চাই ছিল রামমোহনের জীবনের প্রধান ব্রত। তিনি 'উপনিষদের' আলোকেই 'একেশ্বরবাদ' প্রচারে ব্রতী হয়েছলেন। 'উপনিষদ'কে তিনি আধুনিক কালের মানব মাহাত্ম্যের উপর প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হন। সব মানুষই ব্রহ্মময়, সকলেই এক ব্রহ্মের সঙ্গে যোগযুক্ত; সুতরাং, মানুষে মানুষে ভেদ থাকা উচিত নয়— এই ছিল রামমোহনের প্রকৃত মানস-প্রকৃতি। রামমোহনের এই আদর্শ শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের মানস গঠনে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছে।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২—১৮৫৯) যে সময়ে কাব্যচর্চা ও সংবাদপপত্র পরিচালনা করেছেন, তখন বাঙালি সমাজে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, নতুন ও পুরাতন জীবনদ্বন্দ্ব ও সংঘাত অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল। তখনকার পত্রপত্রিকাগুলি শিক্ষিত বাঙালির পরস্পর বিরোধী জীবন চেতনার প্রকাশে আলোড়িত ও মুখরিত হয়ে উঠেছে।

গুপ্ত কবি নিজেই পত্রিকা সম্পাদনার ঐতিহাসিক ভূমিকাতে অবতীর্ণ হলেন। ঈশ্বর গুপ্তের মানস প্রবণতাটি ছিল প্রধানত ঐতিহ্যবাদী ও সংরক্ষণশীল। কোনো প্রকার উৎকেন্দ্রিকতা বা উছৃঙ্খলতাকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তবে, তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল একেবারেই অকৃত্রিম। স্বদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি প্রবল অনুরাগের জন্যে তিনি আধুনিক প্রগতিশীল জীবনাদর্শকে মুক্ত মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর বহু রচনায় স্ববিরোধী মনোভাবও প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচকেরা কবি ঈশ্বর গুপ্তকে 'যুগসন্ধি'র কবি বলে থাকেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও বাঙালির সমাজ জীবনে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১) ছিলেন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবন আসলে এক বিস্তৃত কর্মসাধনার ইতিহাস। বাংলা ও বাঙালির সার্বিক উন্নতির জন্যে তিনি নিরলসভাবে সারাজীবন কর্মসাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। কর্মজীবনের অবসরে তিনি রচনা করেন সাহিত্য, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারমূলক গ্রন্থাদি। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু কুলীনদের বহুবিবাহ রোধ ও বিধবা বিবাহ প্রচলন করে এক মহৎ কীর্তি স্থাপন করলেন। বিদ্যাসাগর হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করে সেই শাস্ত্রের সারবত্তা দিয়েই প্রমাণ করলেন যে,বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ ঘোরতর অন্যায় এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত। বিদ্যাসাগরের জীবনব্যাপী কর্মসাধনার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে বাঙালির কর্ম ও ভারজীবনে।

প্রকৃতপক্ষে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার , সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান চর্চা, বিদ্বৎসভার প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্র প্রকাশ, সমাজ সংস্কার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালির মানস গঠনে রামমোহন-বিদ্যাসাগর ছাড়াও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত , বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ—প্রমুখ মনীষীদের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এঁদের বিবিধ কর্ম ও ভাবসাধনা সমগ্র বাঙালি জাতিকে বিশ্বের দরবারে উপনীত হতে বিশেষ সহায়তা করেছে। বাঙালি জীবনে জাতীয় ভাবাবেগ সঞ্চারেও এঁদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাজনারায়ণ বসু — যিনি ছিলেন মুখ্যত রক্ষণশীল ব্রাহ্মসমাজের অনুগামী, তিনি হিন্দুর জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুরে ' সোসাইটি অব দ্য প্রোমোশান অব দ্য ন্যাশনাল গ্লোরী' স্থাপন করেছিলেন। তখন জাতীয়তা বাঙালি সমাজে এমনি এক মাদকতা সঞ্চার করেছিল যে, তাঁর সহযোগী নবগোপাল মিত্র 'জাতীয় স্কুল', 'জাতীয় ছাপাখানা', 'জাতীয় পত্রিকা', এবং 'জাতীয় ব্যায়ামাগার' স্থাপন করেছিলেন। তাঁকে তখন অনেকেই 'ন্যাশনাল নবগোপাল' বলে ডাকতেন। নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল 'হিন্দুমেলা' নামে একটি সংগঠন স্থাপনা। মনমোহন বসুর দেশপ্রেমমূলক বক্তৃতা, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রথ ম জাতীয়তাবাদী সঙ্গীত পরিবেশিত হয়েছিল এই মেলায়। তরুণ রবীন্দ্রনাথও হিন্দুমেলার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বদেশী গান ও কবিতা রচনা করেছিলেন এই সময়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মধ্যবিত্তর মানস গঠনে এই সব মনীষীদের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এক প্রবল জাতীয়তাবোধের উন্মেষের মধ্য দিয়েই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মানসের পরিণতি ঘটেছে।

মধ্যযুগে বাংলায় সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের একমাত্র মানদণ্ড ছিল বংশগৌরব বা রক্তের সম্পর্ক। বংশানুক্রমিকভাবেই সমাজের প্রতিটি শ্রেণির শ্রেণিমর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকত। যিনি 'চণ্ডীপাঠ' করতেন তিনি 'জুতো সেলাই' করতেন না। সওদাগর শ্রেণি, কারিগর শ্রেণি বা অবস্থাপন্ন কৃষকশ্রেণি ধন-সম্পত্তির দিক থেকে উচ্চ শ্রেণীভুক্ত হবার যোগ্যতা রাখলেও, তাদের সেই শ্রেণিমর্যাদা দেওয়া হ'ত না। সুতরাং, মধ্যযুগে এক শ্রেণি থেকে আরেক শ্রেণিতে উন্নিত হবার সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না। কিন্তু ইংরেজ আমলে মুদ্রাপ্রধান অর্থনীতি মধ্যযুগের

বংশপ্রধান দুর্ভেদ্য শ্রেণিপ্রাচীর ভেঙে দিল। অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় যারা উত্তীর্ণ হতে পারবে, তাদের নিম্ন থেকে মধ্য বা মধ্য থেকে উচ্চ শ্রেণিতে উন্নিত হবার পথে আর কোনো বাধা রইল না। প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শ্রেণিমর্যাদার অবাধ অধিকার স্বীকৃত হ'ল। 'বংশগৌরব', ' কৌলিন্য', এবং 'রক্ত-সম্পর্কে'র আভিজাত্যকে জয় করে নিল সচল, সক্রিয়, সর্ব শক্তিমান 'মুদ্রা'। ক্রমে শিক্ষার গণতান্ত্রিক অধিকারও স্বীকৃত হ'ল। ফলস্বরূপ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণিতে পদোন্নতির সুযোগও পেয়ে গেল সকলে। সমাজে সঞ্চারিত হ'ল 'সামাজিক গতিশীলতা' বা 'social mobility'। মধ্যযুগীয় অচল,অনড় রক্ষণশীল সমাজ যখন ইংরেজের 'মুদ্রা'প্রধান অর্থনীতির ধাক্কায় গতিশীল হয়ে ওঠে, তখন থেকেই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্রুত সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে। মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ছিল মূলত গ্রামীণ; ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজরা গ্রামীণ সমাজ ভেঙে তার মধ্য থেকেই বের করে এনেছিল এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশ শতকের বাঙালি 'ভদ্রলোক'দের প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছিলেন — 'বিষয়ী ভদ্রলোক', 'মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক' এবং 'দরিদ্র ভদ্রলোক'।[১৩] ''বিষয়ী ভদ্রলোকে'রা ছিলেন সম্ভ্রান্ত, ধনী। এঁরা দেওয়ানী ও মুৎসুদ্দিগিরি করে অর্থোপার্জন করতেন। 'মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকে'রা অপেক্ষাকৃত সম্পদহীন; অর্থোপার্জনের জন্যে এঁদের কঠিন পরিশ্রম করতে হ'ত। 'দরিদ্র ভদ্রলোকে'রা ছিলেন প্রকৃতই গরিব; 'বিষয়ী' বা 'মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকে'দের মতো সচ্ছল জীবনযাপন করা এঁদের পক্ষে কখনই সম্ভব ছিল না। তবে,'সামাজিক গতিশীলতা'র কারণে এক শ্রেণি থেকে আরেক শ্রেণিতে উত্তরণের সম্ভাবনাও ছিল তাদের জীবনে।

কিন্তু , ইংরেজের 'মুদ্রা প্রধান অর্থনীতি' যেমন গ্রামীণ সমাজ ভেঙে বের করে এনেছিল এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি, তেমনি এ কাজ করতে গিয়ে তারা গ্রামজীবনের দুটি মূল আশ্রয় কৃষি ও কুটির শিল্পের মূলেও চরম আঘাত হেনেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ কুশাসনের কবলে পড়ে বাংলার কৃষি মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। জমিদারদের কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত কর আদায়ের ফলে জমিদারদের অবস্থাও ক্রমশ শোচনীয় হয়ে উঠতে থাকে । ফলে বাধ্য হয়েই জমিদারেরা জমির উন্নতি, প্রজাস্বার্থ সংরক্ষণ উদাসীন হয়ে পড়েন। পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে , যখন ইংরেজ শাসকেরা 'সিপাহী বিদ্রোহ' দমন করতে যে টাকা খরচ হয়েছিল, তাও তারা তুলে নিতে চাইলেন অতিরিক্ত কর আদায় করে। কৃষির অবস্থা যখন শোচনীয়, তখন ইংরেজের কৌশলী রপ্তানী নীতির কারণে বাংলার কুটির শিল্পও ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে গেল। বাংলার কুটির শিল্পের মধ্যে যেগুলি ছিল উন্নত মানের, বিদেশের বাজারে সেগুলি যাতে রপ্তানী না হয়, তার জন্যে য়ুরোপের বাজারে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানীতে উচ্চ হারে কর ধার্য করা হ'ল; অন্যদিকে— ভারতের বাজারে ব্রিটিশ পণ্য সরবরাহকে উৎসাহিত করা হ'ল নামমাত্র কর ধার্য করে। ফলস্বরূপ ম্যাঞ্চেস্টার, বাকিংহামের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হ'ল ঢাকা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙা, ধনেখালি। একদিকে কৃষি, আর অন্যদিকে —কুটির শিল্প, দুইই যখন ধ্বংসের মুখে তখন মধ্যবিত্ত বাঙালির সামনে একটা ক্ষীণতম ভরসার জায়গা হয়ে দাঁড়ায় ইংরেজি বিদ্যায় শিক্ষা অর্জন করে কেরানির চাকুরি। কিন্তু, এই কেরানির চাকুরিও কিছুদিনের মধ্যেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে যেতে লাগল। ভূমির সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত মানুষের সম্পর্ক যত আলগা হয়েছে, বাঙালি মধ্যবিত্ত যতই চাকুরি নির্ভর হয়েছে, ততই তারা বাধ্য হয়ে দ্রুত পল্লীত্যাগী ও শহরমুখী হয়েছে। শহরে জনস্ফীতির কারণে এবং ইংরেজি শিক্ষার দ্রুত প্রসারের ফলে শিক্ষিতের তুলনায় চাকুরির সংখ্যা ক্রমশ কমে যেতে লাগল। গ্রামীণ জীবনের প্রধান দুটি অবলম্বন কৃষি ও কুটিরশিল্পে মধ্যবিত্ত বাঙালি আগেই আস্থা হারিয়েছে; এবার—নগরে এসে কেরানিমুখী শিক্ষায় সে দৈহিক শ্রমের ক্ষমতা ও মনোবৃত্তিও হারাতে লাগল। বিশ শতকের সূচনায় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ যখন সামান্য কেরানির চাকুরি থেকেও বঞ্চিত হতে লাগল, তখন হতাশা ও বিকৃতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল তাঁরা। তদুপরি 'শিয়রে সংক্রান্তি' রূপে

বাঙালির সমাজ ও পারিবারিক জীবনেও আছড়ে পড়ল প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের প্রবল অভিঘাত। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধোত্তর কালে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজ দাঁড়িয়ে গেল এক প্রবল অস্তিত্ব সংকটের মুখে। সমসাময়িক 'কল্লোল' পত্রিকা তো এই সময়ে বাঙালি মধ্যবিত্তের অস্তিত্বকেই স্বীকার করতে চায়নি।

ধীরে ধীরে পরিস্থিতি কিছুটা বদলাতে থাকে। ১৯১৯-'২০-র পূর্বে ইংরেজ সরকার আমাদের দেশে শিল্পের বিস্তার নিয়ে খুব একটা ভাবিত ছিল না। কিন্তু, যুদ্ধের পর তারা উপলব্ধি করতে পারল যে, ভবিষ্যতে আবার কোনো বড় রকমের যুদ্ধ লাগলে ভারতই হতে পারে এশিয়ায় তাদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি এবং তখন ভারতই যোগাবে তাদের যুদ্ধের যাবতীয় সরঞ্জাম। ফলে এদেশের শিল্পোন্নতির জন্যে তারা ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে শিল্প সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া, ইতোমধ্যেই স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনার ফলে দেশীয় দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়াতেও শিল্পের প্রগতি ত্বরান্বিত হয়েছিল। কিন্তু, শিল্পোন্নয়নের ফলে শহর কলকাতার নাগরিক জীবনে cosmopolitan জীবনধারার প্রসার ঘটে। মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে যান্ত্রিকতা। আবার, প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ। এই মহাযুদ্ধে ব্রিটিশের অধীন ভারতবর্ষও ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পর তার অনিবার্য ফলস্বরূপ দেখা দিল তীব্র বেকার সমস্যা, দারিদ্র্য ও সেই সঙ্গে— দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর। পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পরিণাম স্বরূপ বাঙালির মানবীয় মূল্যবোধও ভয়ঙ্করভাবে বিপর্যস্ত হ'ল। বস্তুত, প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর থেকেই বাঙালি জীবনে একের পর এক দুর্যোগের ঝড় বয়ে গেছে। এই প্রবল ঝড়ের বেগে বাঙালির সমাজ জীবনের চালা ঘরটিও ভেঙে একেবারে তছ্‌নছ্‌ হয়ে গেল। একান্নবর্তী পরিবারপ্রথায় ব্যাপক ভাঙন দেখা দিল। সমাজ ও পারিবারিক জীবনে ভাঙনের পাশাপাশি দেখা দিল মানবিক সত্তার বিপর্যয়। একদিকে সামাজিক বাঁধন ছিঁড়ে গেল, আর অন্যদিকে— সমাজের প্রচলিত রীতিনীতিগুলিও ভেঙে যেতে লাগল। অন্তরের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ, জীবনের মহৎ মূল্যবোধ, শ্রেষ্ঠতম আদর্শভাবনা থেকে ভ্রষ্ট হ'ল বাঙালি। কেউ কেউ মনে করেন যে — "আদর্শের উচ্চকোটি থেকে জীবনদৃষ্টির এই স্খলনই আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় অভিশাপ।" [১৪] প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র দেশে অস্বাভাবিক হারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটে। মূল্যবৃদ্ধির ফলে অনিবার্যভাবেই দেখা দেয় খাদ্য ও বস্ত্র সংকট। শ্রমজীবী ও মধ্যবিত্ত উভয় শ্রেণির মানুষদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। যুদ্ধ– মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনভাবনা বদলে দেয়। দুই বিশ্ব মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিঘাতের পরিণামস্বরূপ মধ্যবিত্ত মানুষ জীবনের অনিত্যতা এবং বর্তমানের ভোগসর্বস্বতাকে সত্য বলে মেনে নেয়। বিশ্ব মহাযুদ্ধের অভিঘাত বাঙালি জীবন থেকে মুছে যেতে না যেতেই ঘটে যায় ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বেদনাদায়ক ও বিপর্যয়ের ঘটনা— 'দেশভাগ'। দেশভাগের ফলে ছিন্নমূল মানুষ তাদের ভিটেমাটি, চিরাভ্যস্ত জীবন ছেড়ে বেরিয়েছিল এক অনির্দেশ্য পথে। এ দেশে উদ্বাস্তু মানুষের ঢল নামে। দেশ ছেড়ে আসবার সময়ে অগণিত মৃত্যু, স্বার্থান্বেষীদের হাতে নারীর অবমাননা, গণনাতীত ধর্ষণ, লুট, খুন— আজও বাঙালি জীবনে নিষ্করুণ স্মৃতি হয়ে আছে। এই সব ঘটনা মধ্যবিত্ত মানুষের চিন্তা অনেকটাই বদলে দেয়।

বিগত শতাব্দীর পঞ্চম দশকে উত্তাল সংগ্রামের তরঙ্গশীর্ষে ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কবল থেকে মুক্ত হয় আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। কিন্তু, লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির অর্থ শুধু সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তিলাভ নয়; তাদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ —একই সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তি এবং জমি, খাদ্য, শিক্ষা, আবাসন,চিকিৎসা, কর্মসংস্থান, ন্যায্য বেতন, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঙালি মধ্যবিত্তের

সেই স্বপ্ন বা আশা পূরণ হয়নি। কালক্রমে দেশের মানুষের মধ্যে বিশেষত সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব সম্পর্কে মোহভঙ্গ ঘটতে থাকে। বাংলায় 'নক্‌শালবাড়ি' আন্দোলন মাথাচাড়া দেয়। বিগত শতাব্দীর সপ্তম দশকে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ঘটে। বাঙালি মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। কিন্তু, সেই সরকারও টিকে থাকতে পারল না। জারী হয় জরুরী অবস্থা। পুনরায় ক্ষমতা দখল করে জাতীয় কংগ্রেস। ১৯৭৭ সাল থেকে পাকাপাকিভাবে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটে। একথা অনস্বীকার্য যে, বাঙালি মধ্যবিত্তের শ্রেণিবোধ ও রাজনৈতিক চেতনা অত্যন্ত তীব্র ও শাণিত। মধ্যবিত্ত শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষা বা সাফল্য-ব্যর্থতার উপরেই শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতায় থাকা বা না থাকা নির্ভর করে। শাসক শ্রেণির মতাদর্শ যেমন মধ্যবিত্তের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, তেমনি প্রয়োজনে সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ও তার বৈপ্লবিক মতাদর্শও মধ্যবিত্ত সমাজ সার্বিকভাবে উপলব্ধি করে থাকে। ইংরেজ আমলে যখন ইংরেজ শাসকদের ঔপনিবেশিক আর্থিক নীতির পরিণামে শিল্প—বাণিজ্যের প্রত্যাশিত উন্নতি ঘটল না, ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, দারিদ্র্যজনিত হতাশা ও ক্ষোভ-বিক্ষোভ দেখা দিল, তখন সেই ক্ষোভ ও হতাশা থেকেই বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে সঞ্চারিত হয়েছিল প্রবল 'জাতীয়তাবোধ'। এই 'জাতীয়তাবোধে'র প্রবল উন্মাদনার টাল সামলাতে না পেরেই ইংরেজরা দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। বস্তুত, মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা বড় অংশের সাহায্য ছাড়া এই ধনতান্ত্রিক সমাজেও শাসকশ্রেণি বা শ্রমিকশ্রেণি কেউই একে অপরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হতে পারে না।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি যথেষ্ট ঐক্যবদ্ধ। অবশ্য তাদের এই ঐক্যবদ্ধতার মূলে রয়েছে 'স্বার্থ'। 'স্বার্থ'ই মধ্যবিত্ত শ্রেণির চালিকাশক্তি। স্বার্থের কারণেই আমরা দেখতে পাই, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক থেকে শুরু করে অফিসের কেরানি সকলেই ঐক্যবদ্ধ। প্রত্যেক পেশা ও বৃত্তিভোগী মানুষেরা তাদের পেশাগত বা বৃত্তিগত 'ইউনিয়ন' গড়ে তুলেছেন। রাজনৈতিক দলগুলিও এই সব ইউনিয়নগুলিকে প্রভাবিত করে তাদের মতাদর্শের শরিক করে তুলতে চায়। কারণ, তারা জানে যে, এই সব 'ইউনিয়ন'ভুক্ত মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশের সাহায্য ছাড়া ভোটের বৈতরণী পার হওয়া সম্ভব নয়। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলার রাজনীতিতে মূল্যবোধের বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে রাজনীতি ছিল 'নেশা'। সেই নেশার টানে বহু মানুষ পার্থিব জগতের সুখ-সম্পদ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করেছিল নিতান্ত অবহেলায়। বর্তমানকালে রাজনীতি পরিণত হয়েছে ক্ষমতা দখলের লড়াই ও জনপ্রিয় 'পেশা'য়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশের ফলে সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কগুলির মধ্যেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, আইন-আদালত, ব্যাঙ্ক, পরিবহন, স্বাস্থ্য, কলকারখানা — রাজনীতির দাপট সর্বত্র। দলগত পরিচয় ছাড়া চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত মানুষ নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারেন কিনা, এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। দল যেখানে বহু– সেখানে মানুষ নানা দলগত পরিচয়ে বিভাজিত। এই দলগত পরিচয় চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত মানুষের বৃত্তি এবং পেশাগত পরিচয়টিকে ছাপিয়ে গেছে কিনা– আলাদাভাবে ভেবে দেখবার মতো সময় বোধহয় এসে গিয়েছে। রাজনীতি শুধু বৃহত্তর সমাজ জীবনেই নয়, বাঙালির পারিবারিক জীবনেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। একই পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থক থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে কলহ, বিবাদ, মতান্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। পাশাপাশি আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, একালের মধ্যবিত্ত মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিজেকে নিরাপদ রাখতে ভীষণ তৎপর হয়ে উঠেছে। সমাজের চারপাশে নানা অন্যায়, অবিচার প্রতিনিয়ত সংঘটিত হতে দেখেও এক শ্রেণির শিক্ষিত মানুষ নিজেকে গুটিয়ে রাখতে ভালবাসেন। শুধু নিজেকে গুটিয়ে রাখাই নয়—প্রয়োজনে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে টিকে থাকা,

অন্যায় দূর করা সম্ভব নয় ভেবে কেবল আত্মরক্ষার প্রবণতা মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের একটি অন্যতম লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে আত্মবিরোধ, আচার-ব্যবহারে দ্বিচারিতা, স্বার্থপরতা দেখা দিয়েছে অত্যন্ত প্রবলভাবে। সামাজিক ও পারিবারিক হিংসায় জড়িয়ে পড়ছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের একাংশ।

উনিশ শতকীয় বাঙালি মধ্যবিত্তের মানস প্রবণতাটি ছিল অনেকটা 'plain living and high thinking'। তাদের জীবনযাত্রায় তেমন বিশেষ কোনো চাকচিক্য ছিল না। একমাত্র তথাকথিত 'বাবু' শ্রেণির মানুষেরাই বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। 'ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী'র সদস্যদের কেউ কেউ স্বভাবত উচ্ছৃঙ্খল হলেও তাঁদের জীবনবোধ ছিল উন্নত মানবতাবাদী আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু, বিশ শতকে পৌঁছে, বিশেষত প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধোত্তর কাল থেকে মধ্যবিত্ত বাঙালি মানস দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যেতে থাকে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে বাঙালি মধ্যবিত্তের মানস প্রবণতা অনেকটাই বদলে যেতে থাকে। ক্রমশ সমাজ যত আধুনিক হয়ে উঠছে, ততই মধ্যবিত্তের জীবন যাপনে বাহ্যিক চাকচিক্য দেখা দিয়েছে। হলিউড-বলিউড-টলিউডের নায়ক-নায়িকা, খ্যাতনামা ক্রীড়াব্যক্তিত্ব, দেশী-বিদেশী মডেল গার্ল— মিস ইন্ডিয়া, মিস ইউনিভার্স, নামকরা ফ্যাশন ডিজাইনারেরা একালের তরুণ-তরুণীদের একটা বড় অংশের কাছে হয়ে উঠেছে অনুকরণীয় আদর্শ। একালে নিতান্ত স্বল্প আয়ের মানুষদেরও কখনও কখনও 'ব্র্যাণ্ডেড পোশাক' পরিহিত দেখতে পাওয়া যায়। একই পোশাক পরিধান করে একাধিক জায়গায় গেলে মধ্যবিত্তের সম্মান থাকে না। যে পোশাক পরিধান করে টিভির পর্দায় আজ একজন মানুষ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করলেন বা সংবাদ পাঠ করলেন– শোনা যায়, অন্তত আগামী ছয় সপ্তাহ তিনি ওই একই পোশাক পরিধান করে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করতে পারেন না। খদ্দরের পোশাক তো মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দেবার মতই অবস্থা। 'ডুয়াল সিম মোবাইল ফোন'– সঙ্গে অবশ্যই ক্যামেরা থাকা চাই। 'কেবল' বা 'ডিশ' সংযোগ ছাড়া টেলিভিশন, 'ইন্টারনেট' ছাড়া কম্প্যুটার, 'এসি' ছাড়া গাড়িতে মধ্যবিত্তের মন ভরছে না। পড়াশুনোর সময় থাকুক আর নাই থাকুক গুটিকতক পুস্তক আলমারির শোভাবর্ধন করবার জন্য মজুত থাকে অনেক মধ্যবিত্তের ঘরে। 'হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট', 'কসমেটিক সার্জারী'র প্রতিও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়েছে। নিত্যনতুন প্রসাধন সামগ্রীর যথেচ্ছ ব্যবহার, রূপচর্চা, 'বডি স্পা', 'হেয়ার স্পা', 'হেয়ার কালার', 'বিউটি পার্লার', 'জিম', 'ডায়েট কন্ট্রোল'– নিজেকে আরো বেশি সুন্দর করে তোলার যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে সর্বত্র।

শহর এবং শহরতলীর মানুষের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনেও আধুনিকীকরণের প্রভাব সংক্রামিত হয়ে চলেছে। পুঁজিবাদী দেশগুলোর উন্নত নানাবিধ সামগ্রি আজ গ্রামীণ মধ্যবিত্ত মানুষেরও নাগালের মধ্যে। মুক্তবাজার অর্থনীতি বিলাস-পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত করে যেভাবে ভোগবাদের প্রসার ঘটাচ্ছে— তা শহর ও শহরতলী ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনেও। কি গ্রাম কি শহর—সর্বত্রই ভোগবাদের প্রবণতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। মদ্য কিংবা নারী একালে অত্যন্ত সুলভ। প্রকাশ্যে পরিমিত মদ্যপান এখন আর ঘৃণ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে না। শহরের কেন্দ্রস্থলে, আনাচে-কানাচে, বড় বড় শপিং কমপ্লেক্সের ভেতর গজিয়ে উঠেছে 'সিঙ্গিং বার', 'ড্যান্স বার'। মধ্যবিত্ত নারী-পুরুষেরাও সেখানে ভিড় জমাচ্ছেন। যুবসমাজের একটা অংশ এগুলির প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। গণমাধ্যমগুলিও মধ্যবিত্তের রুচি, চাহিদা ও ভোগপ্রবণতাকে বাড়াতে অতিসক্রিয় হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের একটা বড় অংশ এর দ্বারা যেমন প্রভাবিত হচ্ছেন, তেমনি পরিণামে তাদের জীবনে শ্রেণিচেতনার বদলে 'স্ট্যাটাস' চেতনার প্রসার ঘটছে। পুঁজিবাদী দেশের উন্নত, উন্নততর নানাবিধ সামগ্রি— কম্প্যুটার, ইন্টারনেট, সেলফোন, ওয়াশিং মেশিন, ভিডিও, ডিজিটাল ক্যামেরা, টু-হুইলার, ফোর-হুইলার, ক্লাব, নাইট ক্লাব, রেস্তোরাঁ, সুইমিং পুল, জিন্স, ফ্যাশন্

শো, নরম ও উষ্ণ পানীয় সবই আজ মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যে। যাঁদের সাধ আর সাধ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই—তাঁদের জন্য রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ব্যাঙ্ক ঋণ। সব মিলিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালির আধুনিক জীবনযাপনের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

একালে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে যৌন সম্পর্কিত সংস্কার অনেকটাই ভেঙে পড়েছে। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধোত্তর কাল থেকে 'ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে'র আধারে নর-নারীর সম্পর্কের দুঃসাহসিক পুনর্বিচার সাহিত্যের পাতায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই লক্ষ করা গেছে। এ-কালে যৌনতাকে বিবাহের শাস্ত্রসম্মত প্রাতিষ্ঠানিক বেড়ায় আবদ্ধ করে রাখতে চাইছেন না মধ্যবিত্ত সমাজের বহু নারী-পুরুষ। শুধু বিবাহিত পুরুষের বিবাহ অতিরিক্ত সম্পর্কই নয়, প্রাক্-বিবাহ দৈহিক সম্পর্কের কথাও প্রায়শই শোনা যায়। ১৩ মে, ২০০০ তারিখে প্রকাশিত 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পরকীয়াকামী মহিলার সংখ্যাও লক্ষণীয়ভাবে বেড়ে গেছে। 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, জন্মনিয়ন্ত্রণের সহজলভ্য পথ ও পদ্ধতি এই সংখ্যা বৃদ্ধির নেপথ্যে কাজ করেছে।'[১৫] ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় 'পতিতাবৃত্তি' আদিম পেশা হিসেবে বহুকাল পূর্ব থেকেই প্রচলিত। একালে তথাকথিত 'পতিতা'দের 'যৌনকর্মী' হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তবে, 'যৌনকর্মী'রা আইনত সমাজের মূল স্রোতে এসে 'দেহ-শ্রম' দান করতে পারে না। তাদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, কালের নিয়মেই এই পেশার মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। একালে— মোবাইল, ইন্টারনেটের যুগে ভোগলিপ্সু পুরুষদের আর 'নিষিদ্ধ এলাকা'য় যেতে হচ্ছে না,তারা তাদের ইচ্ছেমতো যখন-তখন, যেখানে-সেখানে ডেকে নিতে পারেন পছন্দমতো যৌনসঙ্গীদের। ক্লাব, পার্টি, হোটেল, ট্যুরিস্ট লজ, বিউটি পার্লারে প্রায় অবাধে চলছে দেহ-ব্যবসা। পত্র-পত্রিকায় প্রায়শই এ ধরণের সংবাদ প্রকাশিত হতে দেখা যায়। সমাজের বিভিন্ন প্রান্তে সমলৈঙ্গিক সম্পর্কের দাবীও ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। লিঙ্গ পরিবর্তনের ঘটনাও কখনও কখনও ঘটে চলেছে। একালের নারীর কণ্ঠ জোরালো দাবী জানাচ্ছে— '' যার জীবন, যার শরীর, সে-ই ঠিক করবে তার লিঙ্গ কী। তারপর ইচ্ছে হলে সে অঙ্গ অক্ষত রাখবে, কেটে বাদ দেবে, অন্য অঙ্গ লাগাবে। সমাজের কাজ, তাকে সেই স্বাধীনতাটা দেওয়া।" [১৬]

মূল্যবোধ, মানবিক সম্পর্ক, প্রবল আদর্শবাদ নয়— মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের একটা বড় অংশ আজ দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে 'বিত্ত' আর 'ভোগ'-এর পেছনে। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন নিত্যনতুন বিলাসপণ্যের হাতছানিকে উপেক্ষা করতে না পেরে আর্থিক যেন তেন উপায়ে অধিকমাত্রায় অর্থ রোজগারের লুব্ধ প্রচেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের এক বিরাট অংশ। 'টাকা'-ই হয়ে উঠেছে মধ্যবিত্তের ধ্যান-জ্ঞান। শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ মহাশয় বহুদিন পূর্বেই বলেছিলেন —

> যে মন নিয়ে যোব চার্নক সুতানুটিতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে ভবিষ্যৎ কলকাতা মহানগরের ভিত্ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই মন ছিল পাশ্চাত্ত্য বণিকের সজাগ ব্যবসায়ীর মন। নিরাপদ বাণিজ্যে আর্থিক মুনাফার হিসেব ছাড়া কলকাতার প্রতিষ্ঠাতার মনে সেদিন আর কোনো মানবিক সুচিন্তা উদ্ভাসিত হয়নি। জন্মকালের এই মনই কলকাতা শহরের বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে পরিপুষ্ট ও পাকাপোক্ত হয়েছে। ... চার্নকের দেশী বিদেশী উত্তরাধিকারীরা সমস্ত কলকাতা মহানগরকে ধীরে ধীরে এক বিশাল বাণিজ্যকুঠিতে পরিণত করেছেন এবং মহানগরের মানুষগুলোকে তৈরি করেছেন বাণিজ্যের বেচাকেনার পণ্যরূপে। [১৭]

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত আফিমের নেশায় মশগুল হয়ে বিশ্বসংসারের যে চিত্র দেখেছিলেন, তাই যেন বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে একালের বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনে —

> অতএব এই বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার— সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি। সকলেই অনবরত ডাকিতেছে, আমার দোকানে ভাল জিনিষ—খরিদ্দার চলে

আয়— সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য, খরিদ্দারের চোখে ধূলা দিয়া রদি মাল পাচার করিবে। দোকানদার খরিদ্দারে কেবল যুদ্ধ, কে কাকে ফাঁকি দিতে পারে, সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে।[১৮]

কিন্তু, প্রশ্ন হল –'বিত্ত' আর 'ভোগে'র পেছনে অবিরত ছুটে চলা মানুষ সুখী হতে পারছে কতটা। সম্প্রতি ব্রিটেনের 'The New Economic Foundation' সংক্ষেপে ' NEF' থেকে যে 'Happy Planet Index 2012 ' প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, সারা পৃথিবী জুড়েই এখন বিষাদ রোগের প্রকোপ দেখা দিয়েছে। ব্রিটেনের এই বিখ্যাত সংস্থাটি বিশ্বের ১৫১টি দেশে সমীক্ষা চালিয়ে যে সুখ-সূচক তালিকা প্রকাশ করেছে—তাতে ভারতের স্থান ৩২ তম। লক্ষণীয়, পুঁজিবাদী উন্নত দেশগুলির মধ্যে অন্যতম আমেরিকা,ব্রিটেন, জার্মানী প্রথম দশে স্থান পায় নি। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে কোস্টারিকা, ভিয়েতনাম এবং কলম্বিয়া। সমীক্ষাটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে আমরা অত্যন্ত হতচকিত হয়ে পড়ি,যখন দেখি সুখ-সূচকের ক্রমতালিকায় ভারতকে অনেক পেছনে ফেলে দিয়েছে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান। ক্রমতালিকায় এই দুটি দেশের যথাক্রমিক স্থান একাদশ ও ষোড়শ।[১৯]

সমাজ দ্রুত বদলে যাচ্ছে। জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধির কারণে পাল্লা দিয়ে দ্রুত নগরায়ন ঘটছে এবং এই নগরায়ন প্রক্রিয়ায় গ্রাম শহরে পরিণত হচ্ছে, গ্রাম জীবনের পুরানো কাঠামো অনেকটাই ভেঙে গেছে। পল্লীর 'চণ্ডীমণ্ডপে'র বাইরে এসে 'ব্যক্তি' স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নারীস্বাধীনতারও যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের নারীরা আজ আর চারদেয়ালের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নেই। জীবন-জীবিকার নানা ক্ষেত্রে নারীদের বিচরণ লক্ষ করবার মতো। কিন্তু, তাৎপর্যপূর্ণভাবে এ-ও লক্ষণীয় যে, নারীদের স্বাধীনতা দেবার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত পুরুষের মধ্যে দ্বিচারিতাও অত্যন্ত স্পষ্ট। স্কুল, কলেজ, অফিস, মিটিং, মিছিল—সর্বত্র নারী-স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করলেও, নারীর উপর মধ্যযুগীয় অধিকারবোধ কিন্তু আধুনিক মধ্যবিত্ত পুরুষ পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারে নি। নারীদের স্বাধীনতা দেবার সীমাবদ্ধতা মধ্যবিত্ত পুরুষের চিত্তের দ্বিচারিতারই পরিচায়ক। কর্মরতা স্ত্রী দেরি করে বাড়ি ফিরলে—কোনো পুরুষই তাকে প্রশ্ন না করে এড়িয়ে যাবেন বলে মনে হয় না এবং সন্তোষজনক জবাব না পেলে তার রাতের ঘুম যে উবে যাবে—বিষয়টি নিশ্চিত প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। পারিবারিক কোনো বিষয়ে সচরাচর পুরুষের সিদ্ধান্তই কার্যকরী হয়। নারী প্রশ্নহীন আনুগত্য দেখালেই যেন মধ্যবিত্ত পুরুষ খুশি।

একান্নবর্তী পরিবার প্রথায় ভাঙন শুরু হয়েছে অনেক আগেই। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে পরিবার ভেঙে ছোট ছোট 'একক' তৈরির প্রক্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু, একটি বিষয় স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, এই যে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে ছোট ছোট একক তৈরি হয়ে চলেছে - সেই একক পরিবারগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। পূর্বে গ্রাম কিংবা শহর– সর্বত্রই জনবসতির ঘনত্ব কম থাকলেও এক পরিবারের সঙ্গে আরেক পরিবারের পারস্পরিক ঈর্ষা-দ্বেষ-কলহ থাকা সত্ত্বেও সমাজ-বিচ্ছিন্নতা ছিল না বললেই চলে। একালে পরিবারের সঙ্গে পরিবারের দূরত্ব হয়তো দশ হাত বা আরো কম, কিন্তু মানসিক ব্যবধান বিস্তর। আধুনিক নাগরিক জীবনে মানুষ যেখানে বহুতল ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দা—সেখানে এমন মানুষের অভাব নেই যারা কেউ থাকেন এক তলায়, কেউ দোতলায়– অথচ এক পরিবারের সঙ্গে অন্য পরিবারের মানুষের কথাবার্তা হয় কালেভদ্রে। আধুনিক সমাজে পরিবার যেমন ক্রমশ সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, তেমনি আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পুরানো পারিবারিক কাঠামো ভেঙে বেরিয়ে এসে যে মানুষ 'ব্যক্তি' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে— কালের পরিবর্তনে সেই মানুষই কিন্তু আপন পরিবারে থেকেও এক ধরণের মানসিক বিচ্ছিন্নতা অনুভব করে চলেছে। মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কগুলির মধ্যেও লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে। বিশেষত– বয়স্ক বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে নবীন প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই বদলে গেছে। সন্তানের সুসজ্জিত

ফ্ল্যাটে বৃদ্ধ বাবা-মা'য়ের স্থান হচ্ছে না। পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তান সন্ততির সম্পর্ক, দাম্পত্য সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ব, শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক, সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীদের মধ্যেকার সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে।

কিন্তু ,একদিকে পুরানো নীতিবোধ আর অন্যদিকে বাস্তব পরিস্থিতির টানাপোড়েনে মধ্যবিত্ত জীবন যতই টাল খেতে থাকুক না কেন, জীবনে যতই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকুক না কেন, এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রগতির মানদণ্ডে সমগ্র ভারতবর্ষে বাঙালি মধ্যবিত্তর অবস্থান আজও বেশ নজরকাড়া। সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভবের পর থেকে দুই শতাব্দীরও বেশি সময়কাল ধরে সমাজ সংস্কার, ধর্ম সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার, জাতীয়তাবোধের জাগরণ, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতপাত বিচারের অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভের বাসনা, গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই, ভাষার অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন—সমস্ত ক্ষেত্রেই বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনভাবনা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে যথেষ্ট ঈর্ষণীয়। আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, বিজ্ঞান মনস্কতা ও যুক্তিনির্ভরতা, ধর্ম ও জাত সম্পর্কে উদারতা ও সহনশীলতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের সুবাদে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ সারা দেশের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। মধ্যবিত্ত মানুষেরা ব্যক্তিগত চরিত্রে হয়তো স্বার্থ, মিথ্যা গর্ব,ভোগসর্বস্ব,সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী; কিন্তু, সমষ্টিগতভাবে তার রুচি, রসবোধ, বিবেচনাশক্তি, ন্যায়নীতির ধারণা, শুভবুদ্ধি—সমস্ত জাতিকে আজও নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাঁচিয়ে রেখেছে। বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীগণ সারা বিশ্বের নজর কেড়েছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রেও বাঙালি অনেকটাই গৌরব অর্জন করে চলেছে। বিভিন্ন বৃত্তিমুখী শিক্ষাকে গ্রহণ করে মধ্যবিত্ত বাঙালি নিজের পায়ে দাঁড়ানোর অবিরত চেষ্টা করে চলেছে। অজস্র বাংলা প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া আজ সারা ভারতবর্ষে প্রচলিত ও প্রচারিত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ তো বটেই, সমগ্র বিশ্বে আজ মধ্যবিত্ত বাঙালির অবাধ বিচরণ লক্ষ করবার মতো। আধুনিক বাংলা উপন্যাস বাঙালি মধ্যবিত্তের এই বিচিত্র জীবনচর্যাকেই হাতিয়ার করেছে। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্তের মননে যে সব পরিবর্তন সূচিত হয়ে চলেছে, বাংলা উপন্যাস তার সুনিপুণ সাক্ষী।

নির্দেশিকা —

১. 'সমাজ বিজ্ঞানের প্রত্যয়'— হাসানুজ্জামান চৌধুরী। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, জুলাই ২০০৭। বুক চয়েস, বাংলাবাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ—১১০০। পৃষ্ঠা— ২৪৭-২৪৯।

২. তদেব। পৃষ্ঠা—২৪৯।

৩. 'বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত','কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তিহার' — মার্কস. এঙ্গেলস। জুলাই, ২০১২ সংস্করণ। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা.লি.। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা— ২৭।

৪. 'প্রাক্‌কথন', 'বাংলার মধ্যবিত্ত' — দীপেন ঘোষ। দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০০৪। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা—১।

৫. 'আমরা',গদ্য সংগ্রহ—রমাপদ চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারী,২০১১। 'এবং মুশায়েরা'। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা—১১।

৬. 'সেই বাঙালি বাবুটি', গদ্য সংগ্রহ—রমাপদ চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী,২০১১। এবং মুশায়েরা। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা—১৭—১৮।

৭. 'আমরা', গদ্য সংগ্রহ—রমাপদ চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী,২০১১। এবং মুশায়েরা। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা—১১।

৮. তদেব। পৃষ্ঠা—১১।

৯. বাঙালি মধ্যবিত্ত ও তার মানসলোক—সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১৩। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। কলকাতা— ৭৩।
১০. 'বাংলার মধ্যবিত্ত'—দীপেন ঘোষ। দ্বিতীয় মুদ্রণ, অক্টোবর ২০০৪। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা.লি। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা—৬।
১১. 'কলকাতার মন', মেট্রোপলিটন মন. মধ্যবিত্ত. বিদ্রোহ— বিনয় ঘোষ। পঞ্চম মুদ্রণ,এপ্রিল ১৯৯৯। ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড। কলকাতা—৭২। পৃষ্ঠা—৯।
১২. ' সে কাল আর এ কাল' — রাজনারায়ণ বসু। ষষ্ঠ মুদ্রণ—মাঘ ১৪১১ বঙ্গাব্দ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা—২২-২৩।
১৩. 'কলিকাতা কমলালয়'—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পুরাতন বাংলা গদ্য গ্রন্থের সংকলন, ২য় খন্ড,১৯৮১। পৃষ্ঠা—১২৬।
১৪. 'আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ'— রামেশ্বর শ'। প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ২০০৬। পুস্তক বিপণি। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা— ৭১।
১৫. 'ভূমিকা', 'মূল্যবোধ ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস' — চিত্তরঞ্জন লাহা। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০৭। পুস্তক বিপণি। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা—১২।
১৬. 'লিঙ্গসূত্র' — তসলিমা নাসরিন। 'রবিবাসরীয়' আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৬ জুন, ২০১৩। এবিপি প্রা.লি। কলকাতা—১।
১৭. 'কলকাতার মন',' মেট্রোপলিটন মন . মধ্যবিত্ত . বিদ্রোহ' — বিনয় ঘোষ। পঞ্চম মুদ্রণ, এপ্রিল ১৯৯৯। ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড। কলকাতা—৭২। পৃষ্ঠা—১।
১৮. 'বড়বাজার', 'কমলাকান্তের দপ্তর'—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড)। প্রথম কামিনী সংস্করণ। জানুয়ারী ১৯৯১। পৃষ্ঠা—৭৬।
১৯. তথ্যসূত্র— en.wikipedia.org/wiki/ Happy_Planet_Index#2012_ranking.